★ বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি-বৈষম্য বর্বর যুগের চিহ্ন ★

মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদকে বাঁচাবার জন্য দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল মহলে তোড়জোড়

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]   শনিবার, ২রা মাঘ ১৩৫৫, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৯   [মূল্য—দুই আনা

—:০:—

ভারতীয় জাতীয় নেতাদের কাছে আদর্শ গণতন্ত্রী দেশ হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সেখানেই নাকি একমাত্র পূর্ণমাত্রায় গণতন্ত্র বিরাজ করে। সুতরাং তাঁদের মতে জগতের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রী হলেন ট্রুম্যান সাহেব; তাঁর পরে যাঁদের স্থান নেতাদের চোখে পবিত্র একনিষ্ঠ গণতন্ত্রী হিসেবে তাঁরা—এট্লি, শুম্যান, ব্লুম, ডি-গ্যাসপেরি, স্পাক প্রভৃতিরা। এই দলই তাঁদের মতে গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তিকে স্বৈরতন্ত্র ও যুদ্ধের আক্রমন থেকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব নিয়েছেন। এঁদের বাইরে যাঁরা তাঁরা জগত থেকে গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে স্বৈরতন্ত্র আমদানী করতে বদ্ধপরিকর এইরকম কথা নেতারা আমাদের এতদিন শুনিয়ে আসছেন আর সেই কারণেই ভারতীয় রাষ্ট্র এই ধার্ম্মিক গণতন্ত্রী ইঙ্গমার্কিন আঁওতাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেনি। সুতরাং এত কথা, এত প্রচারের পর যদি দলের নেতা যে পথে পা বাড়িয়েছে সেই পথেই কংগ্রেসী নেতারা পা বাড়ান তাহলে বলার কিছু নেই। মার্কিনী গণতন্ত্রে বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিবৈষম্যের টিঁকে থাকতে, শুধু টিঁকে থাকতে নয় দিনের পর দিন বেড়ে চলতে বাধে না। এ হেন পূর্ণ গণতন্ত্রী মার্কিন মুল্লুকে তা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারতবর্ষে তা চালু হতে দোষ কি? তাই ভারতবর্ষের মাটিতে ও যাতে বর্ণবিদ্বেষের বীজ ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা চলেছে জনসাধারণের অগোচরে।

কোন সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী দেশ যখন বিশ্বজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ পরিতৃপ্ত করার মানসে তখন সমগ্র জাতির মনে অস্বাভাবিক উপায়ে এক উত্তেজনা এনে দেওয়া হয়। উত্তেজনার বীজ হয় ধর্ম্মান্ধতা, নয় বর্ণবিদ্বেষ। রাষ্ট্রের প্রচণ্ড প্রচারশক্তি যাদের হাতে, দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রের মালিক যারা তারা জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যে কি রকম অমানুষ করে তুলে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করে তার জলন্ত প্রমান নাৎসী জার্মানী দিয়ে গেছে। এত শীঘ্র তার স্মৃতি জনমন থেকে মুছে যায় নি নিশ্চয়; সভ্যতা বল, সংস্কৃতি বল, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-আচার সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করিয়ে মানুষকে তারা পশুর পর্য্যায়ে টেনে নামিয়ে আনতে কসুর করে নি। এই জাতি-বৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষের আগুনে অসংখ্য নিরীহ লোককে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে, এরই ইন্ধন যুগিয়ে একটা জাতিকে যুদ্ধোন্মাদ করে শিকারী কুকুরের মত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পার্শ্ববর্ত্তী দেশের উপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েও এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেনি, এর ধ্বংস আজও হয়নি। যতদিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বেঁচে থাকবে, যতদিন পুঁজিবাদ টিঁকে আছে ততদিন বর্ণবিদ্বেষ ও জাতি বৈষম্যও থাকবে।

বিশ্বপ্রতিক্রিয়াশীলদের নোতুন আক্রমন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হয়েছে, গণশক্তির প্রভাব ও শক্তি বেড়েছেও সন্দেহ নেই কিন্তু পুঁজিবাদ লুপ্ত হয়নি। নাৎসী জার্মানী হারলেও বর্ণবিদ্বেষ মরেনি। বরং নোতুন করে আবার সারা পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়া পত্তনি নিচ্ছে। ক্রমবর্দ্ধমান গণশক্তির প্রভাবে শঙ্কিত বিশ্বপুঁজিবাদী শক্তি প্রত্যেক দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের একত্রিত করে চলেছে, বর্ণবিদ্বেষ তার এক পথ। জার্মানির ইহুদী বিদ্বেষ আজ আর শুধু জার্মানীতে কিংবা ইহুদী বিদ্বেষে সীমাবদ্ধ নেই; প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই তা ভালভাবে জন্ম নিচ্ছে। পুঁজিপতিরাও তাকে জাগিয়ে তুলছে।

বিশ্বপ্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে জনসাধারণের মনে বর্ণ ও জাতি-বৈষম্য নীতির বিষ ঢুকিয়ে দিতে। মার্কিন মুল্লুকে আজ শুধু নিগ্রোরাই অবাঞ্ছিত নয়, তাদেরই শুধু "বেটোর" মত একঘরে অবস্থায় বাস করতে হয় না অন্যান্য জাতিও সেখানে অবাঞ্ছনীয়। ইহুদীদের বহু হোটেল ও ক্লাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ, মেক্সিক্যানদের বলা হয় "নোংরা জন্তু" ফরাসীদের "ব্যাং" আর ইতালীয়ানদের "wop"। শুধু তাই নয় ওয়াল ষ্ট্রীটের প্রভুদের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে সমাজনীতিকেরা পর্য্যন্ত সকলেই উগ্র জাতিবৈষম্যনীতি প্রচারে মেতে উঠেছেন। এঁদের মতে মার্কিন জীবন যাত্রার উপর জাতিগত প্রভাব নাকি খুব বেশী এবং মার্কিন সভ্যতার প্রভাবে এক বিশেষ ধরণের গুণাবলী-বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সে গুণাবলীও নাকি সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুদরের। নিজের জাতিকে যদি বড় বলে মনে করেই ক্ষান্ত থাকত তাহলে বলার কিছু ছিল না; কিন্তু আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল মহল আজ বিশ্ব-বিজয়ের অভিযানে ব্যস্ত। সুতরাং এই জাতি-বৈষম্য নীতিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী রূপ দিতে তারা উদ্গ্রীব, হিটলারের উগ্র আক্রমনাত্মক জাতীয়তাবাদ এখানে পুরাদমে প্রচার হচ্ছে। শুধু তাই নয় যে যুক্তি নাৎসী দল গ্রহণ করেছিল সেই একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি চালাতে কসুর করছে না তথাকথিত সেরা গণতন্ত্রী দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। জার্মানীতে যেমন ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনি মার্কিনেও তাই চলেছে। জাতি সমস্যার প্রকৃত সমাধান নাকি নিম্নতর জাতি-গুলিকে স্বতন্ত্র করার মধ্যে দিয়ে করা যাবে। তাই ওয়াল ষ্ট্রীটের কর্ত্তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিলবো মার্কিন রাষ্ট্রকে "নিম্নতর জাতিগুলিকে দেশ-ছাড়া" করতে পরামর্শ দিয়েছেন। জার্মানীতেও যেমন আর্য্যরক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সবকিছু করা হয়েছিল আমেরিকাতেও তাই চলেছে। এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই হ্যান্টিংটন ত পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন—

—অন্যান্য পৃষ্ঠায় দেখুন—

—:০:—

- রেলশ্রমিক ও কেরাণী ভাই, হুঁসিয়ার!
- কথা-প্রসঙ্গে
- পররাজ্যে মার্কিন ঘাঁটি
- জাপানে ফ্যাসিবাদ কায়েমের চেষ্টা
- প্রগতিশীল আর্ট
- ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কালাকানুন বিরোধী সভা

ও

অন্যান্য সংবাদ

পৃথিবী হল শক্তিমান ও দুর্ব্বলের সংগ্রাম ক্ষেত্র; আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন কোন কোন জাতির অধঃপতন এবং কোন কোন জাতির উন্নতিই ঘটায়। এ কথার পরই বলা হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার অধিকাংশ লোকই বিশেষ গুণাবলী ও নেতৃত্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। সুতরাং স্বভাবতঃই সারা বিশ্বের সম্পদ তাদেরই অধিকারে যাওয়া একমাত্র যুক্তিসঙ্গত

(৭ম পৃঃ দেখুন)

রেলশ্রমিক ও কেরাণীভাই, হুঁসিয়ার!

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পে কমিশন যখন সরকারী কর্ম্মচারীদের মূলবেতন, মাগগীভাতা প্রভৃতি বিষয় স্থির করেন তখন রেলশ্রমিকের বেলায় তাঁহারাই রায় দেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি অনুযায়ী ভবিষ্যতে মাগগীভাতা দেওয়া হইবে, রেলশ্রমিকদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষা ভাতা দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কমিশন। ইহা সত্ত্বেও মোট যে মজুরী তাঁহারা পাইবেন তাহাতে যে, কোন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—একথা পর্য্যন্ত কমিশনকে মানিতে হইয়াছিল। সুতরাং যে মজুরীতে, মালিক পক্ষের কমিশনই বলে, শ্রমিক বাঁচিতে পারে না, সেই মজুরী স্বীকার করিয়া লইয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইবার কথায় কোন শ্রমিকই রাজী হইতে পারে না এবং এই কারণে বার বার রেল শ্রমিক সরকারকে যাহাতে পে কমিশনের অনুমোদিত মাহিনার হার বাড়ে তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ক্ষমতাসীন নেতাদের কানে গরীব রেলশ্রমিকের সে আবেদন পৌঁছাইলেও তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা ত করেনই নাই উপরন্তু পে কমিশনের সুপারিশ গুলি পর্য্যন্ত তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কমিশন যখন তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন তখন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক মূল্যমান ছিল ২৬০ আর বর্ত্তমানে তাহা ৩৯৫ এর মত হইলেও আজ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত মূল্যের অনুপাতে মাগগী ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং সরকার পক্ষ দিতে রাজীও হন নাই, শিক্ষা-ভাতা পে কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে শ্রমিকের হাতে তাহা আজ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে নাই। ইহা ছাড়া সস্তা রেশনের অনেকগুলি জিনিষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ত সরকার গ্রেণশপ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর; ক্লাসিফিকেশনের নাম করিয়া বহু দক্ষ শ্রমিককে অর্দ্ধদক্ষ বা অদক্ষ বিভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছে ফলে তাঁহাদের মজুরী কমিয়া গিয়াছে। নিত্যনব ছাঁটাই চলিতেছে; খাটুনী, অপ্রচুর ছুটী, বাড়ীভাড়া সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু স্থির হইল না। মাসের পর মাস, এডজুডিকেশন, শালিশী আর কনফারেন্সে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে আর শ্রমিককে পেটে পাথর বাঁধিয়া জাতীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ও দেশ ভক্তির প্রমান দিবার উপদেশ বর্ষিত হইতেছে। এই প্রাণান্তকর অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সমগ্র রেল কর্ম্মচারী ও শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন বাধ্য হইয়া।

কিন্তু ধর্ম্মঘটের আগে ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কতকগুলি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে রেল কর্ম্মচারী ও শ্রমিককে। সফলতা সহকারে এই গুলি কাটাইতে পারিলেই তবে নিশ্চিৎ জয়লাভ হইবে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রেল শ্রমিক ধর্ম্মঘটের গুরুত্ব অনেক। যদি ধর্ম্মঘট হয় এবং তাহাকে নিশ্চিতই রূপ দিতে হইবে যদি কর্ম্মচারী ও শ্রমিকের দাবী স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এত বড় ধর্ম্মঘট আর হয় নাই। এবং ইহার সফলতা বিফলতার উপর শুধু রেল শ্রমিকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে না, ইহার উপর সমগ্র সরকারী কর্ম্মচারীদের ভাগ্যই ঝুলিতেছে। ইহাতে জয়ী হইতে পারিলে ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান মালিক তোষণ ও শ্রমিক শোষণ নীতিকে বন্ধ করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে; কিন্তু অসফল হইলে যে নিষ্পেষণ আজ পূর্ণ রূপ লইতে পারে নাই শ্রমিক সংহতি ও আন্দোলনের ভয়ে তাহা শ্রমিক শ্রেণীর দুর্বলতা ও সংগ্রামে পরাজয়জনিত দুর্বল মনোবলের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভরেতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের গলা টিপিয়া মরিবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়াই সমস্ত দিক হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে, সংগ্রাম কালে যে যে দিক হইতে আঘাত আসিতে পারে তাহার সমস্ত কিছুর জন্যই তৈয়ারী থাকিতে হইবে।

রেলের মালিক জাতীয় সরকার। সেই হিসাবে সর্বপ্রথম আঘাত আসিবে কংগ্রেসী সরকারের নিকট হইতে। ইতিমধ্যেই দমন-নীতি অবিরতভাবে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে একদিকে, অন্য দিকে রেল শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিভেদনীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। এলাকায় এলাকায় সংগ্রামী কর্মীদিগকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, কয়েকস্থানে গুলিও চলিয়াছে। ই, আই, আর এর জেনারেল ম্যানেজার এক নির্দ্দেশে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা-প্রসঙ্গে

—: ০ :—

নেতারা যে রীতিমত রসিক ব্যক্তি এ কথাটা এত দিন জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম সারাটা জীবন যাঁরা খাঁটি গান্ধীয় উপাদান ও উপায়ে প্রস্তুত হবিষ্যান্নের ওপর দিয়ে কাটিয়ে দিলেন তাঁদের রসস্থ হবার সম্ভাবনা কম। বর্দ্ধমানে পশ্চিম বাংলার কৃষিসচিব শ্রীযুক্ত পাঁজার বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারছি ধারণাটা আমাদের বেমক্কা রকমের ভুলই ছিল। মন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন—"শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই তিনটি বিষয়ের উপরই দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বৃটিশ আমলে এগুলির প্রতি উপেক্ষা যেখান হ'ত কারণ শোষণই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। নবলব্ধ স্বাধীনতা দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার মহা সুযোগ এনে দিয়েছে এবং সরকারও নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।" নেতাদের সচেতনতার যে প্রমান মিলছে তাতে আমাদের অচেতন হতে দেরী হবে না এটা ঠিক। সর্বজনবিদিত কুখ্যাত লীগ আমলে বাংলা দেশে শিক্ষা বাবদে খরচ হ'ত মোট আয়ের শতকরা ৯ ভাগ; স্বাধীন ও সচেতন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমলে তাকে টেনে এনে দাঁড় করান হয়েছে শতকরা ৬ ভাগে। আর স্বাস্থ্য বিষয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছে তা আরও অতুলনীয়। সম্প্রতি কলিকাতা সহরে যে চিকিৎসক সম্মেলন হয়ে গেল তাতে জানা গেল এদেশে রোগের আক্রমনে প্রতি বছর ৬২ লক্ষের উপর লোক অকালে মরে। এর কারণ হিসেবে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে অপুষ্টি, অল্পপুষ্টি, পর্য্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবই প্রধান। রেশনিংএর দেখতায় যে হারে খাদ্যদ্রব্য দিনের পর দিন পরিমানে নামছে সেই অনুপাতে কিংবা তারও বেশী হারে ভেজাল তাতে বাড়ছে। আর চিকিৎসার ব্যবস্থা অনবদ্য! ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতালের বেডের সংখ্যা হাজারকরা ·২৪। এরপর যদি অকালমৃত্যু কারও ঘটে তাহলে তাকে জাতীয় সরকারকে অপদস্থ করার জন্যই দেশদ্রোহীর অপচেষ্টা ছাড়া কিছু বলা যেতে পারেনা।

* * *

বাংলাদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—স্ত্রী ভাগ্যে ধন। বিবাহে যেখানে যৌতুক মেলে সেখানে যে কিছুটা ধন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই আসে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রবচনটা বোধ হয় একটু পুরাণ হয়ে গিয়েছে কারণ স্ত্রী হবার আগেই বাগদত্তা অবস্থাতেই ধনপ্রাপ্তি, সম্মানপ্রাপ্তি, এখন ঘটছে। সংবাদে প্রকাশ ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীর ভাগিনেয়ী ও শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মীর কন্যা কুমারী চন্দ্রলেখা পণ্ডিতের সঙ্গে হিমাচল প্রদেশের চিফ কমিশনার মিঃ এন, সি, মেহতার পুত্র শ্রীমান অশোক মেহেতার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়েছে। এর পরই খবর পাওয়া গেল শ্রীমান মেহতাকে সায়গনে ভারতীয় দূত হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। বাগদত্তা অবস্থাতেই যদি এই হয় বিবাহ হলে কি হবে? এতদিন মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবুদের নামে এই বিষয়ে একটা দুর্নাম ছিল এখন দেখা যাচ্ছে সব পাখী মাছ খায় নাম হয় মাছরাঙার; শুধু বড়বাবু নয়, বড় সাহেব, বড় কর্ত্তা, বড় মন্ত্রী, কেউই বাদ যায় না।

* * *

পশ্চিম বাংলা সরকারের "অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" অভিযান যেভাবে দিনের পর দিন সফল হয়ে চলেছে তাতে যে শেষ পর্য্যন্ত কতদূর গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই "অধিক খাদ্য ফলাও" খাতে ১৯৪২-১৯৪৩ সালে—২১,৫৩,৩৮১ টাকা ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে—৯৯,৮৯,৯৪০ টাকা ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে—৬৫,৪৪,৮৯২ টাকা ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে—৮৪,২১,৭০৫ টাকা ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে—৯৪,০২,০৫৫ টাকা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে ১৯৪৮ সালের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত ৭৪,৫৩,০০০৲ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে বাজেটে ১,৬৫,৯৬,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বিরাট টাকা যখন খরচ করা হচ্ছে তখন খাদ্যশস্য বেশী ফলা উচিত অথচ দিনের পর দিন ফসল কমেই চলেছে। পশ্চিম বাংলার স্বাভাবিক ধান উৎপাদন হয় বছরে ৫৪ লক্ষ টন। গত বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে তার জায়গায় হল ৪৮ লক্ষ টন আর এ বছর ফলনের পূর্ব্বাভাষ থেকে জানা যায় মোট ফসলের পরিমান হবে সাড়ে ৪৬ লক্ষ টন। অর্থাৎ স্বাভাবিক ফলনের চেয়ে সাড়ে ৭ লক্ষ টন কম। পশ্চিম বাংলার জনসংভরণ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন এই অবস্থা থেকে বাঁচবার উপায় হিসেবে বলেছেন—"যদি আমরা জাতির মঙ্গল কামনা করি, পশ্চিম বাংলাকে খাদ্য সংকটের হাত থেকে বাঁচাতে চাই তাহলে আমাদের আঁছাটা চাল খেতে শিক্ষা করতে হবে।" সরকার পক্ষও স্বীকার করেছেন ৫৪ লক্ষ টন ফললেও পশ্চিম বাংলার নিজস্ব চাহিদা মেটে না। সুতরাং যখন আরও কম ফলেছে তখন যে আঁছাটা চাল খেলে কেমন করে খাদ্যসংকট থেকে ত্রান পাওয়া যায় তা নেতারাই জানেন। তবে একটা কথা ঠিক—নেতাদের খাতিরের লোকদের "অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" এর নামে বেশ কিছু খাওয়াতে হলে আমাদের আঁছাটা চাল কেন, ধানের ভূষি ও খেতে হবে। তাতে আমাদের আপত্তি যে নেই তা ইতিমধ্যেই আমরা প্রমান করে দিয়েছি—রেশনের দোকানের পচা চাল, রবার চাল (রাঁধলে রবারের মত এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে যায়) আর কাঁকর মেশান চাল খেয়ে। বেঁচে থাকুক নেতাদের "অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" অভিযান।

পররাজ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি

[ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে আদর্শ দেশ হ'ল আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র। তাই মার্কিনী ধরণের শাসনতন্ত্র গৃহিত হচ্ছে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে, মার্কিনী শিক্ষায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করার জন্য আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানকার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারকে, মার্কিনী জীবন ধারা চালু করার কাজে প্রচার চলছে চলচ্চিত্র, বেতার আর সাময়িক পত্রিকার মারফৎ। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ইঙ্গ-মার্কিন চক্রে যোগ দিয়েছে—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু এ কথা স্বীকার করেছেন জয়পুর কংগ্রেসের বৈঠকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শিবির যে বিশ্বশান্তির জন্য কিরকম উগ্রভাবে উদগ্রীব তার প্রত্যক্ষ প্রমান মিলিবে কমরেড ভাইমফের নিম্নোক্ত প্রবন্ধটিতে। অসংখ্য দেশ জুড়ে সারা বিশ্বে যে ৪৮৯ টি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে যে একত্রিত করা হচ্ছে, চীনের ও গ্রীসের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে জেহাদ চলছে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট বর্ব্বর ফ্যাসীবাদীদের দ্বারা—এ সব হ'ল মার্কিন কায়দায় বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। ভারতের কংগ্রেসী সরকার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশান্তি রক্ষার নামে বিশ্বজয়ের এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করছেন। ভারতীয় জনসাধারণের কর্ত্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদীদের এই হীন ষড়যন্ত্র থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত গণতন্ত্রী শান্তিকামী শিবিরকে শক্তিশালী করে তুলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তুতিকে ধ্বংস করা। সঃ গঃ]

এন্, ভাইমফ্

আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী সোবিয়েৎ ও নব্য গণতন্ত্র বিরোধী আক্রমনাত্মক ষড়যন্ত্রের পোষণার্থে শান্তিকালে বিশ্ব-জোড়া সামরিক ঘাঁটি দখলে অগ্রসর হইয়াছে। বিদেশী পত্রিকায় দেখা যায় যে কানাডা গ্রীণল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপ আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর, গ্রীস, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য স্থান মিলাইয়া সোবিয়েতের চারিদিকে আমেরিকার ৪৮৯ গুলি সামরিক ঘাঁটি রহিয়াছে। মার্কিন সমর সচিব মিঃ রয়্যাল গত ২৯ শে সেপ্টেম্বরে মিসৌরিতে এক বক্তৃতায় বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে; যে সকল দেশে এই ঘাঁটিগুলি আছে সেগুলি মিলাইয়া লোক সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান।

স্পেন ও উহার উপনিবেশগুলির ভৌগলিক অবস্থান যুদ্ধের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্পেন ও উহার উপনিবেশগুলিকে বিশাল নৌ ও বিমান ঘাঁটিতে পরিণত করা হইতেছে। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে ফ্রাংকো মাদ্রিদের বারাকাস্ বিমান ঘাঁটিটি আমেরিকাকে বিক্রয় করেন। স্পেনের বৃহত্তম বিমান ঘাঁটি হইল বার্সিলোনার প্রাৎ ঘাঁটি; উহা ভ্যালেন্সিয়ার মর্নিসাস বিমান ঘাঁটি এবং অন্য সমস্ত স্পেনীয় বিমান ঘাঁটি আজ আমেরিকার আয়ত্তাধীন। মার্কিন বিমান বহরের উপযোগী করিয়া ঘাঁটিগুলি মার্কিন পদ্ধতিতে এখানেই নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইতেছে। স্পেনে, বেলিয়ারিক্ ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে এবং মরক্কোতে আরও বহু (৭০ টির অধিক) নূতন বিমান ঘাঁটি নির্ম্মিত হইতেছে। আফ্রিকায় স্পেনের যে সকল উপনিবেশ রহিয়াছে সেগুলিকে আমেরিকা নিজ ব্যূহের পশ্চাৎ রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে চায়। আফ্রিকায় সামরিক স্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত জেনারেল উইলসন গত বৎসরের শেষের দিকে স্পেনে পদধূলি দেন। তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল সারা আফ্রিকা জুড়িয়া পারস্যোপসাগরের বসরা নৌ ও বিমানঘাঁটি পর্য্যন্ত সামরিক ঘাঁটি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা। এই ঘাঁটি শৃংখলাগুলির প্রধান যোগাযোগ স্থল হইল স্পেনীয় গায়নার বাটা বিমান-ঘাঁটি। ফ্রাংকোর সহিত উইলসনের সাক্ষাতের পরই বাটা বিশাল বিমান-ঘাঁটিতে পরিণত করা হইয়াছে। ফার্নান্দো পো দ্বীপের রাজধানী সান্তা-ইজাবেলকে নৌ ঘাঁটিতে পরিণত করা হইতেছে। মাদ্রিদ হইতে মার্কিন সাংবাদিক হেনরি বাক্লে সংবাদ দেন যে "মার্কিন নৌ ও বিমান অভিজ্ঞেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

পোর্ত্তুগালের সামরিক ঘাঁটিগুলিও আমেরিকার হাতে চলিয়া যাইতেছে। ১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর চুক্তি অনুসারে ৩ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত আজোসের লাগেনো বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক বিমান নামিতে পারিবে। এজন্য কোন ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হইবে না। আরও প্রকাশ যে পোর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ম্যাকাও, টিমোর এবং মোজাম্বিকে কতকগুলি বিমান ও নৌ ঘাঁটি নির্ম্মিত হইবে। তাছাড়া সেতুবাল, ইবোরা পন্তদা সোর এবং ব্রাগান্সা নগরীতেও কতকগুলি ঘাঁটি নির্ম্মিত হইবে।

ইতালী ও উহার উপনিবেশগুলি মার্কিন ঘাঁটিতে পরিণত হইতেছে। মার্কিন নৌবহরের ১৪ খানি রণপোত নেপল্স, তরন্তো, লিভর্নো, জেনোয়া ও অন্যান্য ইতালীয় ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিতেছে। গত ২ রা ফেব্রুয়ারী রোমে যে মার্কিন ইতালীয় চুক্তি গুপ্তভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে কোন তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকাকে ইতালী হইতে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাইতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া ইতালীর বন্দর ও ঘাঁটিগুলিও আমেরিকা ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে এবং লিবিয়া, ইরিত্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে আমেরিকা ইচ্ছামত সামরিক ঘাঁটি গড়িতে পারিবে। গত জানুয়ারী মাসে মার্কিনরা ত্রিপলির মেল্লাহা ঘাঁটিটি বাগাইয়া লইয়া বৃহত্তম মার্কিন বিমান বহর রাখিবার আয়োজন করিয়াছে। মেল্লাহায় ৭০ টি বৃহত্তম বোমারু ও ৩০০ জঙ্গী-বিমান থাকিতে পারে। "মেসাগেরো" পত্রিকায় প্রকাশ যে উত্তর আফ্রিকায় কাস্তেল বেনিতো, ত্রিপলী, বেনিনা বেনগাজি ও তোব্রুক বিমান ঘাঁটি-গুলিও আমেরিকা পাইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা যে তথাকথিত "আত্মরক্ষা ত্রিভুজ" করিয়াছে উহার উপরের কোণ হইবে ফিলিপাইন এবং ভূমি হইবে পানামা হইতে সামোয়া হইয়া নিউ হেব্রাইডস্ পর্য্যন্ত। ফিলিপাইনস্থিত সেবু ঘাঁটি হইবে অন্যতম কেন্দ্র। অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে পোর্ট প্রিন্সেস, তাউই তাকই, গিমেরা (বনিন ও র‍্যুকু) তন্তুতা, মাজেস্তা, এস্পিরিতু সান্তো ও নিউমিয়া (নিউক্যালিডোনিয়া), ইফাতে (নিউ হেব্রাইডস্) গুয়াদাল-কনোর (সলোমন) এবং মানাস এডমিরাল্টি)। মার্শাল, ক্যারোলাইন ও মারিয়ানা ইত্যাদি যে সকল দ্বীপ আগে জাপানের ম্যাণ্ডেট ছিল সে-গুলিতেও জাপানের বনিন রুক্যু দ্বীপে আমেরিকা সামরিক আড্ডা গাড়িতেছে। শুধু তাহাই নহে, ব্রিটেনের, ফ্রান্সের ও অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাণ্ডেট নিউ ক্যালিডোনিয়া, নিউ হেব্রাইডস্ ইত্যাদি দ্বীপেও আমেরিকা আসিয়া জাঁকিয়া বসিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরকে এই "ভাবে মার্কিন সাগরে" পরিনত করা হইতেছে।

হংকং হইতে "চয়া সিয়াং পাও" পত্রিকা খবর দিতেছে যে হেইনান দ্বীপকে আমেরিকা একটি সশস্ত্র ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছে। সম্প্রতি মার্কিন রিয়ার এডমিরাল মারে মন্তব্য করিয়াছেন যে হেইনানের ইউইলিন বন্দর হইবে "দ্বিতীয় পার্ল হার্বার।"

ব্রিটেন ও ফ্রান্স আমেরিকা'র ঘাঁটিতে পরিণত হইতেছে ইভনিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশ যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যত দিন "Cold war" চলিবে ততদিন আমেরিকা তাহার এক শক্তি-শালী বোমারু বহর ব্রিটেনে মোতায়েন রাখিবে। আরও প্রকাশ বোমারু সংখ্যা ৯০ হইতে বাড়াইয়া ৩৬০-৪০০ করা হইতেছে। সেজন্য আরও ৮-৯টি ঘাঁটির প্রয়োজন। আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপ-নিবেশগুলিতে মার্কিন ঘাঁটি রহিয়াছে; খাস ফ্রান্সেও হইবে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে মার্কিন ঘাঁটি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। —টাস্

সাহেব মালিকের মুনাফার বলি ৫জন শ্রমিক।

ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন কারখানায় দুর্ঘটনা—২৫ জন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ, ৭ জন হত।

মৌভাণ্ডার (ঘাটশিলা)— গত ৭ই জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের পি, সি, প্ল্যাণ্টে রাত্রি ১২ টার সময় এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে ২৫ জন শ্রমিক মারাত্মক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। এই পর্য্যন্ত ৭ জন মারা গিয়াছেন; বাকি ২১৩ জনের অবস্থা উদ্বেগজনক। প্রকাশ যে রাত্রি ৯ টায় সময় "বিমে" আগুন লাগে এবং ভাল মত আগুন না নিবাইয়াই এসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের হুকুমে ইলেকট্রিক পাখা চালাইবার ফলে উক্ত প্ল্যাণ্টের 'পাইপ' ফাটিয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ১৯২৯ এবং ১৯৩৯ সালে দুইবার এই ব্যাপার ঘটে তথাপি কোম্পানী কোন সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। কোম্পানীর হাসপাতালে মাত্র ১৩ টি সীট আছে; তাহাও আবার নামে, সেখানে কোন সুবন্দোবস্তই নাই। ইহার জন্য দুর্ঘটনার পরের দিন বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত কোন প্রকার চিকিৎসা করা হয় নাই। বিছানা, কম্বল, সীট, ঔষধ কিছুই ছিল না। স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত ১১ টার সময় অনুসন্ধান করিতে যায়। অবশেষে শ্রমিকদের চাপে পড়িয়া কোম্পানী বাহিরের একজন চিকিৎসকের সাহায্য লইতে বাধ্য হয় ঐ সময়। যে বিলাতী কোম্পানী এক ১৯৪৮ সালেই মুনাফা লুটিয়াছে ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা এবং কারখানা ও খনিতে যাহাদের ৮।৯ হাজারের মত শ্রমিক কাজ করেন সেইখানে এইরূপ অব্যবস্থা তথাকথিত স্বাধীন ভারতের নেতাদের চোখের উপরেই ঘটিতেছে অথচ ইহার প্রতি-কারের চেষ্টা নাই। মজুরদের দাবী—বেসরকারী তদন্ত চাই, আহতদের বিবৃতি জনসমক্ষে প্রচার করিতে হইবে এবং যাহার হঠকারিতায় এই দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহার শাস্তি চাই। মৃত ব্যক্তিদের নাম— ১) মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জ্জী, (২) এস, সি, রায় ৩) নলিনী দত্ত, ৪) ওয়াজ উদ্দিন, ৫) সুলতান, ৬) মহম্মদ আলি, ৭) ফকির উদ্দিন।

রেলশ্রমিক ও কেরাণীভাই, হুঁসিয়ার !

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জানাইয়াছেন, ষ্ট্রাইট ব্যালট গ্রহণ, ভোটের কেন্দ্র স্থাপন, পোষ্টার প্রভৃতি লাগাইবার এবং সভা করিবার সুবিধা রেল এলাকার মধ্যে দেওয়া হইবে না। যাহাতে শ্রমিকরা বাহিরেও সভা করিয়া নিজেদের সংগঠিত করিতে না পারে তাহার জন্য ১৪৪ ধারার আশ্রয় লওয়া হইতেছে। রাণাঘাট, আসানসোল, বনগাঁ প্রভৃতি রেলকেন্দ্রে ইতিমধ্যেই তাহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জামালপুর ইউনিয়ন অফিসে পুলিশ হানা দিয়া দরকারী কাগজপত্র, ইস্তাহার ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে, ইউনিয়ন কর্ম্মীদের গৃহে ব্যাপক থানা-তল্লাসী চালাইয়া শ্রমিক সাধারণকে সন্ত্রস্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। জাতীয় সরকারের রেল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শান্তনম হুমকি দিয়া জানাইয়াছেন—"রেল ধর্ম্মঘট হইলে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন এবং বর্ত্তমান শ্রমিকনেতৃত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই কথার সোজা অর্থ দাঁড়ায় যদি ধর্ম্মঘট হয় তাহা হইলে সরকার সেই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য যথা-শক্তি ক্ষমতা নিয়োগ করিবেন এবং যে কোন রকম ফ্যাসিবাদী বর্ব্বর আক্রমন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। একদিকে এই নগ্ন অত্যাচার অন্যদিকে ইতিমধ্যে এক শ্রেণীর কর্ম্মী-দিগের মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া তাহা-দিগকে হাত করিয়া ধর্ম্মঘট বানচাল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহাদের মাহিনা বাড়াইয়াছে তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে সরকারের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন-ভাবে ঘুস লইয়া (ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার জন্য বর্দ্ধিত মাহিনাকে ঘুস বা দালালী ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় কি?) আপনার শ্রমিক ভাইদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা তাঁহারা করিতে পারেন না এবং তাঁহারা যে ইহা করিবেনও না ইহা আশা করা যায়। বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজও পুরাদমে চলিতেছে। জাতীয় সরকার, শিশুরাষ্ট্র, মুদ্রাস্ফীতির দোহাই পাড়িয়া সমানে প্রচার চলিতেছে। তাহার উপর যাহাতে জনসাধারণ এই ধর্ম্মঘটকে সাহায্য না করে এবং এমন কি জনসহানুভূতিও শ্রমিকরা না পায় সেই উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—ধর্ম্মঘট হইলে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ বন্ধ হইয়া যাইবে ও তাহার ফলে তাহাদিগকে অনাহারের সম্মুখীন হইতে হইবে। কারখানাগুলিও নাকি বন্ধ হইয়া যাইবে। অথচ কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। যে জাতীয় সরকারই চোরাকারবার চালাইতে পরোক্ষ সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন, পুঁজিপতিশ্রেণীকে অবাধে মুনাফা লুঠিবার সুযোগ দিয়া মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনিয়াছেন, জাতীয়তার নামে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা ও শ্রমিকের আইন সঙ্গত অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া চলিয়াছেন, রেলের দেশী ও বিলাতী বড়-হোল্ডারদিগকে বৎসরে বৎসরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা বিলাইতেছেন, মোটা বেতনের উচ্চ কর্ম্মচারী পুষিয়া অহেতুক অর্থ নষ্ট করিয়া চলিতেছেন তাহার কথা শ্রমিকরা শুনিবে কেন, জনসাধারণই বা বিশ্বাস করিবে কেন?

কংগ্রেসী সরকারের বড়-কর্ত্তাদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে আই, এন, টি, ইউ, সি। যেখানে যেখানে তাহাদের সামান্যমাত্র সমর্থন আছে সেইখানেই তাহারা ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতেছে। তবে সুখের বিষয় ফ্যাসিবাদী সরকার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর এই নগ্ন দালালদের রেল শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের উপর প্রভাব নাই।

বিরুদ্ধতা ও প্রত্যক্ষ শত্রুতা কংগ্রেসী সরকার ও আই, এন, টি, ইউ, সি হইতে আসিলেও শ্রমিকের বিপদ সেইদিক হইতে খুব নাই কারণ তাঁহারা জানেন বিরুদ্ধতা ঐদিক হইতে আসিবেই আসিবে। আর জানেন বলিয়াই প্রস্তুত ও তাঁহারা হইয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ শত্রু অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের ভয়ই বেশী। যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান কারণ প্রচ্ছন্ন মালিক শ্রেণীর দালালদের সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ সেই বিশ্বাস-ঘাতকের দল রেল শ্রমিকদের নেতাদের মধ্যে শুধু আছে তাহাই নয় প্রচুর সংখ্যায় আছে। রেলওয়ে মেন্সফেডারেশনের নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে রহিয়াছে জয়-প্রকাশী সমাজতন্ত্রী ও ভথাকথিত স্বাধীন ট্রেডইউনিয়নিষ্টরাই তাঁহাদের মধ্যে সংখ্যায় অধিক। অথচ এই জয়-প্রকাশী সমাজতন্ত্রীদের কথা কে না জানে! কলিকাতার ট্রামশ্রমিক ধর্ম্মঘটের কথা এবং তাহাতে ইহাদের পরিচালিত ট্রাম মজদুর পঞ্চায়েতের নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সকলেই জানে! সুতরাং এইদিকে প্রস্তুত হইতে হইবে সর্ব্বাপেক্ষা। সময় বুঝিয়া জাতীয় সরকারের দলে ঢলিয়া পড়িয়া পুঁজি-পতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিতে ইহারা ওস্তাদ; শুধু ওস্তাদ নয়, তাহাই ইহাদের একমাত্র কাজ। অভাবিত ও হঠাৎ আসা বিপদ কাটাইতে হইলে ইহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। রেল শ্রমিক ও কেরাণী ভাইদের বুঝিতে হইবে—সোস্যাল ডিমোক্রেসির কাজ হইল, পুঁজিপতি রাষ্ট্রের নিষ্পেষণে অতিষ্ট ও অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের এক অংশকে বিপ্লবী আন্দোলন হইতে দূরে রাখিয়া পুঁজিবাদের দুর্ব্বলতম সময়ে তাহাকে কৌশলে বাঁচাইয়া রাখা। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ফ্যাসীবাদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া জনতার বা তাহার একাংশের আস্থা অর্জ্জন করিয়া তাহাদের দ্বারা পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষা করে কৌশলে। তাই একদিকে চলে পুঁজিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার, অন্যদিকে আবার তাহাদের সহিত দহরম মহরম চলে মন্ত্রীত্বের গদী পাইবার জন্য, একদিকে শ্রমিকদারদের অভিনয় চলে অন্যদিকে শ্রমিকের মূল দাবীকে পুঁজিপতিদের পায়ে বিলাইয়া দেয়; একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি রক্ষার কথা বলে অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী অভিযানের নাম করিয়া জঙ্গী শ্রমিকদের পুলিশের হাতে তুলিয়া দেয়। ধর্ম্ম-ঘটের কথা বলিয়াও ইহাদের, ধর্ম্মঘটকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বানচাল করিয়া দিয়া শ্রমিককে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে বাধে না। জয়প্রকাশী দলের ব্যবহারে ও এই সবগুলি লক্ষ্য করা যাইবে। নেহেরু সরকারকে ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়াও কয়েকদিন আগে মন্ত্রীত্বের পদ লইয়া পণ্ডিতজীর সহিত জয়প্রকাশের আলোচনা চালাইতে বাধে নাই, রেল শ্রমিকের ভাল করিবার কথা বলিয়াও তাঁহাদের বিনানুমতিতে তাঁহাদের প্রধান দাবী গ্রেনশপপ্রথাকে বাদ দেওয়া, মাগগী ভাতাকে কমাইয়া লইতে স্বীকার ইতিমধ্যেই জয়প্রকাশ করিয়াছেন রেল মন্ত্রীর সহিত আলাপ আলোচনায় অথচ এই আলাপ আলোচনা চালাইবার ক্ষমতা রেল শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে দেন নাই। ধর্ম্ম-ঘটের জন্য যখন রেল কর্ম্মচারীদের মধ্যে সংহতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ হাঁকিলেন—"সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী কমুনিষ্ট বিরোধী, তাহারা অনেক বেশী দৃঢ়তার সহিত কমুনিষ্ট দের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন।" এই কম্যুনিষ্ট জেহাদের রূপও লইয়াছে জঙ্গী রেল শ্রমিককর্ম্মীদের গ্রেপ্তার ও হায়রাণীতে সরকারের সহিত সহযোগীতা ও সাহায্যের মধ্য দিয়া। ধর্ম্মঘটচলা-কালীন অবস্থায় শ্রমিকদের মত না লইয়াই ইহারা ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বহুক্ষেত্রে, সম্প্রতি কলিকাতার ট্রাম ধর্ম্মঘট তাহার প্রমান। সুতরাং কে জানে নিজেদের স্বার্থে নেহেরু প্যাটেল চক্রের সহিত গদী বা অন্য কিছু বিষয়ে দরদস্তুর করিয়া সময় মত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া ইহারা ধর্ম্মঘট বানচাল করিতে চেষ্টা করিবে না? তাহাই হইবে ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং রেলশ্রমিকও কেরাণী ভাইদের সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা মাঝপথে নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেরাই আন্দোলন পরিচালনা করিতে পারেন। তাহার জন্য প্রস্তুতি দরকার, সংগঠন দরকার, নতুবা প্রয়োজনের সময় আগাইয়া আসিবার লোক পাওয়া যাইবে না। সেই সাংগঠনিক প্রস্তুতিই এখন হইতে করিয়া যাইতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা ভালভাবে মনে রাখা দরকার। আন্দোলনের পথে যদি সন্ত্রাসবাদী উপায় অবলম্বিত হয় তাহা হইলে ধর্ম্মঘট চূর্ণ হইয়া যাইবে। শ্রমিক শ্রেণী যদি প্রস্তুত হইয়া আন্দোলন করে সরকারের সৈন্য ও পুলিশের সহিত এবং সে আন্দোলন যদি নিয়মতান্ত্রিকতার পথ না ধরিয়া গণ-অভ্যুত্থানের রূপ লয় তাহা হইলে তাহাকে যাহারা বাধা দেয় কিংবা তাহার মূল্য বোঝে না তাহারা স্বাধীনেমী কায়েমী স্বার্থের দালাল। কিন্তু তাহা করিতে হইলে চাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতি—চিন্তাগত ভাবে এবং ক্ষেত্রগত ভাবে—ভারতবর্ষে আজও গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং সেই ধরণের গণ-অভ্যুত্থানের পরিবর্ত্তে আজ ঐ হিংসাত্মক পথে পা বাড়াইলে আন্দোলন পথ ধরিবে সন্ত্রাসবাদের। সে পথ শ্রমিক শ্রেণীর নয়, শ্রমিক শ্রেণীর ভালর জন্যও নয়। সে পথকে ত্যাগ করিতে হইবে। কোন নেতৃত্ব যদি এই পথে আন্দোলন পরিচালিত করিতে চায় তাহা হইলে সেই নেতৃত্বকেও ত্যাগ করিয়া সঠিক নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে রেলশ্রমিক ভাইদের। সংগ্রামে সফল হইতে হইলে ধৈর্য চাই; হঠকারিতায় কোন কাজ হইবে না বরং তাহা বিপদ ডাকিয়া আনিয়া ধর্ম্মঘটকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এই কথা বলার প্রয়োজন-১৯৪৭ সালের জুন মাসের ধর্ম্মঘটে ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছিল বোম্বাইএ জি, আই-পি ও বি-বি-সি-আই রেল শ্রমিক ধর্ম্মঘটে। উৎক্ষিপ্ত শ্রমিক ওয়ার্কশপের রেডিও চুরমার, ম্যানেজারের ঘরের আসবাবপত্র আক্রমন, সিগনালের তার কাটা, ডাইনিং ও উচ্চ শ্রেণীর কামরায় কামরায় অগ্নি সংযোগ, প্রভৃতি করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রতিক কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক ধর্ম্মঘটেও বোমা নিক্ষেপ হইয়াছে। যে নেতৃত্বের প্ররোচনায় ইহা ঘটে তাহা শ্রমিক আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছে—শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবী পথ ধরিতে হইবে। ইহা বিপ্লবের পথ নয় সন্ত্রাস-বাদের পথ। এ কথা বলার অর্থ নয় শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতি সাধন করা, শ্রমিক ভাইদের ন্যায্য দাবীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা। ভুল পথে চালিত শ্রমিক শ্রেণীকে ঠিক পথে লইয়া আসিতে হইবে; তাহা না করিয়া যাহারা শ্রমিক শ্রেণীর অজ্ঞতা ও ভাবালুতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে রোমাঞ্চকর পথে ঠেলিয়া দিতে চায় তাহারাই শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু। এই সব দিক বিবেচনা করিয়া সমস্ত কিছু বিঘ্ন, বিপদ, অত্যাচার, অদৃষ্ট ও অভাবিত বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইয়া ধর্ম্মঘটে নামিতে হইবে রেল শ্রমিক কেরাণী ভাইদের—তাহা হইলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

এস, ইউ, সির কর্মীর উপর পুলিশী জুলুম

সম্প্রতি কামারহাটির এস, ইউ, সির বিশিষ্ট শ্রমিক কর্মী কমরেড আবদুল গফুরকে স্থানীয় পুলিশ পোষ্টার লাগাইবার অজুহাতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কুঠিমাটি থানায় তাঁহার উপর নির্য্যাতন করা হয় এবং স্থানীয় এস, ইউ, সির নেতৃবৃন্দের গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কয়েকদিন পর গত ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহাকে ৪০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার উপর প্রত্যহ থানায় হাজিরা দিবার আদেশ জারী করা হইয়াছে। কমরেড গফুর আগড়পাড়া জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও স্থানীয় এস, ইউ, সির বিশিষ্ট কর্মী। পুলিশ স্থানীয় কর্মীদের হায়রান করিবার উদ্দেশ্যে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিয়া ত্রাস সঞ্চারের চেষ্টায় আছে বলিয়া প্রকাশ।

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে 'কালা-কানুন' প্রতিবাদ সভা

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড প্রমোদ সিংহরায়ের বক্তৃতা

—: o :—

গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে কালা কানুন প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বি-পি-টি-ইউ-সির সহসভাপতি কমরেড সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী। সভায় ছাত্র ও শ্রমিকের বিরাট সমাবেশ হয়।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পক্ষ হইতে কমরেড প্রমোদ সিংহ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন সরকারের কালা কানুনের প্রয়োজন পড়ে তখনই যখন দেশের জনসাধারণের উপর সরকারের আস্থা থাকে না এবং দেশের জনসাধারণও সরকারের প্রতি আস্থাহীন হইয়া তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে চায়। আমাদের দেশের কংগ্রেসী জাতীয় সরকারের সেই দশা। নবলব্ধ ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একদিকে নেতারা পুলিশী অর্ডিন্যান্স-রাজ চালু করিয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত বিরুদ্ধ কণ্ঠকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছেন, অন্যদিকে নেতাদের এই ফ্যাসিবাদী বর্ব্বর আক্রমনে জনমনে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমা হইয়াছে পাছে তাহা আন্দোলনের আকারে ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে সেই ভয়ে জনসাধারণের মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবীগুলিও তাঁহারা নির্বিচারে ছাঁটাই করিয়া চলিয়াছেন। দেশ শাসন করিতে হইলে জনতার আস্থাভাজন হওয়া দরকার অথচ জনসাধারণের আস্থাভাজন হইতে হইলে যাহা করা দরকার তাহার কংগ্রেসী সরকার আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু ত করেনই নাই বরং চাষী মজুর কেরানীর উপর নিত্য নব শোষণ ও অত্যাচারের বোঝা বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। এ কথাটা নেতাদের জানা বলিয়াই তাঁহারা জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন না ফলে তাহাদিগকে জোর করিয়া দাবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহার জন্য লাঠি, গুলি, গ্যাস, ১৪৪ ধারা, বেআইনী কালা কানুন প্রভৃতি যতগুলি অস্ত্র ফ্যাসিবাদীদের জানা আছে তাহার কোনটাই প্রয়োগ হইতে বাদ পড়ে নাই। শুধু বাংলাদেশেই এ অবস্থা নয়, কালা কানুনের প্রয়োগ বাংলার নিজস্ব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়; ইহা হইল পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের সাধারণ শাসন ও শোষণ নীতি। তাই যতদিন পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই অবস্থার পরিবর্ত্তনও আসিবে না, এক কালা কানুনকে রুখিলেও অধিকতর উগ্রতা লইয়া নূতন কালা কানুন জন্ম লইবে। এই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিয়া জনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই তবে ইহা হইতে নিষ্কৃতি মিলিবে। শুধু সরকার পাল্টাইলেই মুক্তি মিলিবে না, নেহেরু সরকারের স্থলে জয়প্রকাশী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। বুঝিতে হইবে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক দাবীর সঠিক মূল্য স্বীকৃত তখনই হইবে যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হইবে।

কমরেড সিংহ রায় সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, এইদিকে তাহাদিগকেই আগাইয়া আসিতে হইবে কারণ তাহারাই বিপ্লবের প্রধান শক্তি। একদিকে ফ্যাসিবাদী ভারত সরকার যখন শিশুরাষ্ট্রের ধোকাবাজীতে কায়েমী স্বার্থ রক্ষা ও মেহনতী জনসাধারণের উপর নির্বিচারে দমননীতির রথ চালাইয়া যাইতেছেন তখন নিজেদের মধ্যে সমস্ত রকম বিভেদ ও বিভ্রান্তিকে দূরে ফেলিয়া দিয়া সমগ্র শোষিত জনসাধারণের ঐক্যফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা না করিয়া যাহারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নূতন করিয়া বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝিতে হইবে তাহারা শ্রমিকের কেহ নয়, শ্রমিক-দরদীর অভিনয়কারী মালিকের দালাল তাহারা। তাহাদের ধাপ্পাবাজীকে ব্যর্থ করিয়া এ, আই, টি, ইউ, সির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে পারিলে তবে এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হইবে। সর্ব্বশেষে তিনি ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকার ও তাহার দালাল বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন।

সভায় কমরেড বিমল রায় চৌধুরী, দিলীপ ভট্টাচার্য্য, ভার্গবরা শ্রমিক কমরেড নিসার ও নৃপেন ব্যানার্জী এবং কমরেড সভাপতি বক্তৃতা করেন।

সভায় কালা কানুন ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইবার আহ্বান জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—

টালিগঞ্জ ক্লাব ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা

সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ হইয়া পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের পথে নামিয়া আসিতে আহ্বান

গত ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় টালিগঞ্জ ক্লাব ময়দানে টালিগঞ্জ ক্লাব ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী।

কমরেড সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে দিনের পর দিন জিনিষ পত্রের দাম যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে শ্রমিক ভাইদের বাঁচিবার কোন উপায় নাই; মালিকের মুনাফা বাড়িতেছে, জিনিষপত্রের দাম বাড়িতেছে, সরকারী সাহায্যে বাড়ীওয়ালা বাড়ীর ভাড়া বাড়াইতেছে, শ্রমিককে বেশী খাটিতে হইতেছে কিন্তু তাহার মজুরী বাড়াইবার কথা বলিলে সরকার পক্ষ বলিয়া উঠেন মজুরী বাড়ান যায় না কারণ মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়িবে। মালিকের কোটী কোটী টাকা মুনাফা বাড়িলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না আর শ্রমিকের সামান্য আয় বাড়িলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজী। এর একমাত্র উদ্দেশ্য মালিকের লাভ যাহাতে না কমে তাহার চেষ্টা করা—শ্রমিকের পেট কাটিয়া ধনীর পকেট ভরাইবার কৌশল। এই জন্যই মালিকের মুনাফা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিলেও তাহাকে কমাইবার চেষ্টা নাই কিন্তু শ্রমিকের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার-ধর্ম্মঘটের অধিকারকে বেআইনী করা হইয়াছে। যতদিন যাইবে এই জুলুমের মাত্রা ততই বাড়িবে। সুতরাং সময় হইতে সাবধান এবং প্রস্তুত না হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য। শ্রমিকশ্রেণীর যে দুর্বলতা ও তাহার মধ্যের যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির জন্য পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকার এই ফ্যাসিবাদী আক্রমন করিতে সাহস পাইতেছে সেই দুর্বলতাকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের মধ্যেকার বিভেদ ও বিভ্রান্তি দূর করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। এই আন্দোলন শুধু অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না তাহাকে যাহাতে পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক রূপ দেওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করিতে পারিলে তবে শ্রমিকের দুঃখের চির অবসান হইবে তাহার আগে নয়।

কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী কর্তৃক বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাব পঠিত হইলে পর সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহিত হয়। ইহার পর এম, জি, কুদ্দুস প্রস্তাবিত এবং মিহির চন্দ্র সিংহ সমর্থিত মাহিনা, মাগ্‌গী-ভাতা, প্রভিডেণ্টফাণ্ড, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি দাবীসংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহিত হয়। সভায় বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতা ও সংহতির উপর জোর দিয়া যে সমস্ত দল এ, আই, টি, ইউ, সি হইতে বাহির হইয়া গিয়া ভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন গড়িতে যাইতেছেন তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা করিয়া, এ, আই, টি, ইউ, সির মধ্যে থাকিয়া তাহাকে শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তুলিবার অনুরোধ করিয়া এবং মালিক ও সরকারের দালাল আই এন টি ইউ সি, ও হিন্দ মজদুর সভা হইতে শ্রমিক ভাইদের দূরে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব আনেন কমরেড অজিত সেন; সমর্থন করেন ভজহরি মিত্র। ইহা ব্যতীত সরকারী শ্রম ও শিল্প নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া এবং দণ্ডিত শ্রমিক ও কৃষক কর্ম্মীদের মুক্তি দাবী করিয়া আরও দুইটি প্রস্তাব গৃহিত হয়।

সভায় আলোচ্য বৎসরের জন্য নিয়োক্ত ব্যক্তি গণকে লইয়া শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে

সভাপতি—হাবিচন্দ্র সাঁতরা,
সহসভাপতি—পণ্ডিত হরিকিষণ ও মহম্মদ আবদুল রেজাক,
যুগ্মসম্পাদক—মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ও অজিত সেন,
সহসম্পাদক—মিহির চন্দ্র সিংহ ও গোকুল সিং
কোষাধ্যক্ষ—থরক বাহাদুর;
কার্য্যকরী সমিতির সভ্য—মেথু রায়, ভজহরি মিত্র, আবদুল কুদ্দুস, হিরৎ মণ্ডল, শ্যামাচরণ দাস, দীনবন্ধু বারিক, বৈরাগী, লটপট হোসেন, কৃষ্টিয়া পাত্র, নগিনা, বাজালী সর্দ্দার, তেজ প্রসাদ, কেষ্ট মালি, গোপাল মালি।

—

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবস। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের প্রত্যেক ইউনিটকে জানান যাচ্ছে যে তাঁরা যেন দিনটি উপযুক্তভাবে পালন করেন। লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন, সম্ভব হ'লে প্রকাশ্যে জনসভা ও মিছিলের অনুষ্ঠান নয়ত বস্তিতে বস্তিতে গ্রুপ মিটিং, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক—প্রাদেশিক কমিটি,
(পশ্চিমবাংলা)

মার্কিন তাঁবেদারীতে জাপানকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তৈয়ারী করা হইতেছে

—:০:—

নিরস্ত্রিকরণের নামে নূতন রণসজ্জা ; জনস্বাস্থ্য বিভাগে ভূতপূর্ব্ব সমরনায়কদের নিয়োগ ; যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ; গুপ্ত ফ্যাসিবাদী দল "Z-F" গঠন

—:০:—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার আগে হইতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার জয়লাভে ভীত সাম্রাজ্যবাদী শিবির পরিষ্কার বুঝিতেছিল, নির্বিবাদে ও নিশ্চিন্তে শোষণ করিবার দিন শেষ হইয়া গিয়াছে ; জনতা সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসনকে দূর করিবার জন্য প্রস্তুত এ কথা প্রতিক্রিয়াশীল মহলের অজানা ছিল না। আর অজানা ছিল না বলিয়াই যুদ্ধ শেষ হইবার পরও যাহাতে যুদ্ধে প্ররোচনাদানকারীরা শান্তি না পাইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে ভালভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহার পাকা ব্যবস্থাও তাহারা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বহুদিন শেষ হইলেও পরাজিত জাপান যাহাতে আবার একটি শক্তিশালী আক্রমনাত্মক সামরিক দেশ হিসাবে জাগিয়া উঠিতে না পারে, তাহার জন্য যেসমস্ত চুক্তি মিত্রপক্ষের মধ্যে হইয়াছিল তাহাকে বাস্তবে কার্য্যকরী করিবার কোন আগ্রহই দেখা যাইতেছে না আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের। শুধু আগ্রহ নাই তাহা নহে, যে কয়টি পুঁজিবাদী পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জাপ সরকার একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে তাহাদের কেশ স্পর্শও করা হয় নাই। এই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাই জাপানকে একটির পর একটি যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া জনসাধারণের উপর দুঃখকষ্টের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে ; ইহাদেরই জন্য জাপান আজ আমেরিকার অনুগ্রহভাজন, পরাধীন। মার্কিন গণতন্ত্রী জেনারেল ম্যাক আর্থারের কৃপায় আজ জাপানের জনতা, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যে দুঃখ কষ্টের অবধি নাই অথচ যাহারা জাপানের এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহারা দিব্য আরামে আমেরিকার ওয়াল ষ্ট্রীটের কোটিপতিদের সহযোগিতায় ও সাহায্যে সমানে মুনাফা শীকার করিয়া চলিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জাপানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘাঁটি গাড়িতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

মিত্রপক্ষের মধ্যে পরাজিত জাপানকে লইয়া কি করা হইবে সেই সম্বন্ধে যেসমস্ত চুক্তি হইয়াছিল তাহার সর্ব্বপ্রধান বিষয় ছিল জাপানের সৈন্য ও সামরিক অফিসারের সংখ্যা হ্রাস এবং যুদ্ধ শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করা ; অথচ Allied Council for Japan-এর সোভিয়েট প্রতিনিধি ১৯৪৬ সালের ৫ই জানুয়ারী প্রামাণ্য দলীল ও তথ্যাদি দ্বারা তথাকথিত নিরস্ত্রিকরণ ব্যুরো যে আসলে সামরিক অফিসারদের গুপ্ত সামরিক প্রতিষ্ঠান এ কথা সর্বসমক্ষে প্রমান করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে কাজ চালাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই নিরস্ত্রি-করণ ব্যুরো ভাইস-এডমিরাল মিনোরো মেয়েদো, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিয়াজাকি প্রভৃতি সমরনায়কদের ন্যায় এক হাজারের অধিক সেনাপতি লইয়া গঠিত হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিটি অভিযানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া তাহা হইতে মূল অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করা। নিরস্ত্রি করণের নামে এইভাবে ব্যুরোকে সামরিক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করা হইল।

দীর্ঘ কয়েক বৎসর কাজ চালাইতে দিবার পর ১৯৪৮ সালের ৩১শে মে এই নিরস্ত্রিকরণ ব্যুরোকে ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে একটি নিরস্ত্রিকরণ সম্পূর্ণ করিবার ব্যুরো স্থাপিত হয় এবং ইহাকে জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে আনা হয়। জনস্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসকরাই নিযুক্ত হইবেন ইহাই স্বাভাবিক কিন্তু জাপানে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সামরিক অফিসাররাই এই বিভাগকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানীতেও এইভাবে প্রধান প্রধান সমরনায়কদের "ফাইল ক্লার্ক" হিসাবে আরচিভস্ ব্যুরোতে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। যে উপায় অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে জার্মানীকে নূতনভাবে একটি শক্তিশালী ফ্যাসিবাদী সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছিল সেই একই প্রথা অবলম্বন করিয়া তথাকথিত সেরা গণতন্ত্রী দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে শক্তিশালী ফ্যাসিবাদী মিত্র হিসাবে পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শুধু যে রণনায়কদেরই এইভাবে নিয়োগ করা হইতেছে তাহা নহে, জাপানের সাধারণ সৈন্যদের পুলিশ বিভাগে লওয়া হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানে স্থল-পুলিশের সংখ্যা যত ছিল বর্ত্তমানে প্রায় দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ১ লক্ষ ২৫ হাজারে দাঁড় করান হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাকে ৩ লক্ষের মত করিবার জন্য কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশেষ ধরণের সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা ১০ হাজার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও পরাজিত জার্মানী ঠিক এই ভাবেই পুলিশ বাহিনীর মধ্য দিয়াই তাহার সৈন্য বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিল। জার্মানীর ১ লক্ষ পুলিশই হিটলারের ভবিষ্যত সৈন্যবাহিনীর প্রধান শক্তিতে পরি-বর্ত্তিত হইয়াছিল।

স্থল বাহিনীকে গড়িয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে নৌবাহিনীকে গড়িয়া তোলা হইতেছে। সরকারীভাবে স্বীকৃত হয় যে জাপানের বর্ত্তমান ডুবো জাহাজ, ডেষ্ট্রয়ার প্রভৃতির সংখ্যা হইতেছে ২৮। কথা ছিল ইহা মিত্রশক্তির মধ্যে বিতরিত হইবে। কিন্তু আমেরিকান কর্ত্তৃপক্ষ এইগুলি জাপানকে ফেরত দিয়া দিয়াছে এবং বর্ত্তমানে নৌবিভাগে শিক্ষা দিবার জন্য নৌ পুলিশ নৌকার (Naval Police Boat) সংখ্যা ১০০ করিতে দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে ধীরে ধীরে জাপানের নৌশক্তিকে বাড়াইয়া তুলিতে দেওয়া হইতেছে প্রশান্ত মহাসাগরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শক্তি-শালী নৌবহর পাইবার আশায়।

ভূতপূর্ব্ব সৈন্যদের লইয়া যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার। ইহাদের প্রকৃত কৃষি প্রতিষ্ঠান বলা ভুল, ইহারা হইল আসলে সামরিক বাহিনীর অংশ কারণ সমবায় পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেওয়া হইয়াছে একজন করিয়া কর্ণেলের উপর। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে সামরিক সংগঠন গড়িয়া ও তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া যাহাতে সকলে একই কেন্দ্রীয় আদেশে পরিচালিত ও শিক্ষিত হয় তাহার উদ্দেশ্যে মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ "Z-F" নামে একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত সমগ্র জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদী সিণ্টো সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইতেছে ; ইহাদের সংখ্যা ১২৬০ টির মত হইবে। এই সমস্ত দলের নেতৃত্ব কোসাবুরা, তাচিবানা, তাকামরি সায়গো, রেহি উচিদা প্রভৃতির মত নাম করা ফ্যাসিষ্টদের হাতে। এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান— কিকুহাতা দোশিকই। ইহারাই জাপানের সাম্যবাদী নেতা টোকুডা ও বিখ্যাত ট্রেডইউনিয়ন নেতা কিকুমানির জীবন নাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

জাপানের যুদ্ধ-শিল্পগুলিও বন্ধ করিয়া যুদ্ধের খেসারত হিসাবে দিবার কথা হয় এবং সেইমত ১৯৪৬ সালের প্রথমে স্বীকৃত হয় যে ১০৯০টি শিল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেড কোয়াটার ইহাকে পরে ৯৩৪ তে নামাইয়া আনেন এবং ১৯৪৭ সালের শেষে উহা ৭০০ তে আসিয়া দাঁড়ায়। যে শিল্পগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহার মধ্যে আবার ১১৩ টি বিমানপোত কারখানা। এইভাবে জাপানের যুদ্ধ-শিল্পগুলিকে টিকাইয়া রাখিয়া জাপানকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্টা চলিতেছে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের তরফ হইতে।

নিত্য নব বিমান অবতরণ ক্ষেত্র তৈয়ারী করা হইতেছে। যুদ্ধের সময় যতগুলি বিমান ক্ষেত্র ছিল তাহার একটিকেও নষ্ট করা হয় নাই বরং ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার খরচ করিয়া নূতন বিমান ঘাঁটি তৈয়ারী করা হইতেছে। নৌ ঘাঁটিগুলিকে আবার সংস্কার ও পরিবর্দ্ধিত করা হইতেছে।

যে ফ্যাসিবাদী আক্রমনে চীন ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল সেই ফ্যাসিবাদকেই পুনর্জীবিত করিতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের বিশ্বজয়ের অভিযানে জাপানকে কাজে লাগাইতে। সেই অভিযানকে রোধ করিতে হইলে চাই নিজের দেশের পুঁজিবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে একত্রিত করিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিশ্ব সমাজতন্ত্রী শিবিরকে শক্তিশালী করা। সেই কর্ত্তব্যকেই বাস্তবে রূপ দিতে হইবে। *

—

মৌভাণ্ডারে শ্রমিকদের সাধারণ সভা

মালিকের জুলুমবাজী বন্ধ করিতে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ

মৌভাণ্ডার (ঘাটশিলা) ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের রোলিং বিভাগে কিছু দিন যাবৎ উৎপাদন কম হইতেছে এই অজুহাত দেখাইয়া শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করিবার হুমকি কর্ত্তৃপক্ষ দেখাইতেছে ; অথচ শ্রমিকেরা রীতিমত পুরা ৮ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহাদিগকে মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য পর্য্যন্ত ছাড়া হইতেছে না। শ্রমিকেরা উৎপাদন হ্রাসের প্রমান চান কিন্তু কোম্পানী তাহা দিতে অক্ষম হয়। মজুরেরা মালিকের এই জুলুমের প্রতিবাদে একটি সাধারণ সভা ডাকেন এবং অত্যাচারকে রুখিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

* জে, পোলেস্কির প্রবন্ধ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত।

বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি-বৈষম্য বর্বর যুগের চিহ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং তার জন্য সামরিক প্রস্তুতিও যে অন্যায় নয় এ কথাটা জোর কদমে প্রচার চলেছে। এর সঙ্গে হিটলার, গোয়েবলস-এর প্রচারের পার্থক্য নেই এতটুকুও। এই উগ্র বর্ণ-বিদ্বেষ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে "কু ক্লাক্স্ ক্ল্যানের" মত কুখ্যাত দলের নিগ্রো ধর্ষণ। এর নামই হল মার্কিনী গণতন্ত্র।

কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই যে এই বিষয়ে পথ দেখাচ্ছে তা নয়। গ্রেট বৃটেনেও চলছে এই ধারা তবে এত উগ্রভাবে ও প্রকাশ্যে নয়—এই যা তফাৎ। "Union of British speaking Peoples" পত্রিকায় লর্ড আমেরির প্রবন্ধে আমেরিকার কোটি-পতিদেরই মতের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি হল বৃটীশরা। সেই শ্রেষ্ঠ রক্তের জোরেই পৃথিবীতে শোষণ চালিয়ে যাবার অধিকার তাদের থাকতে বাধ্য। এ মত বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল মহলে নোতুন আশা এনে দিয়েছে। মোসলের ফ্যাসিষ্ট দল একে বাস্তবে কার্য্যকরী করার চিন্তাও করছে।

বৃটীশ কমনওয়েলথের বিশেষ করে ভারতবাসীর উপর কি জঘন্য অত্যাচার চলেছে জাতি শ্রেষ্ঠতার দোহাই পেড়ে, তা সকলেরই জানা। উগ্র জাতীয়তাবাদী মালানের জয়লাভ আরও উগ্রভাবে এই ফ্যাসিবাদী অভিযান চালনার ইঙ্গিতই দেয়। গণতন্ত্রী অষ্ট্রেলিয়ায় কালা ও হল্‌দে আদমির স্থান নেই স্থায়ীভাবে বাস করার। অষ্ট্রেলিয়া হল সাদা চামড়াধারীদের খাস উপনিবেশ।

ভারত সরকারও পেছিয়ে নেই

এই ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরের অংশীদার ভারতীয় রাষ্ট্রও এদিকে পেছিয়ে থাকতে পারে না। নেতাদের স্বাধীনতা আনার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে প্রাণ বলি দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী গৃহহারা সর্ব্বহারা হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভেসে চলেছে। একদিন নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার যাদের করা হয়েছিল, যাদের সমস্ত রকম সুখসুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ক্ষমতা দখলের পর তারা হয়ে উঠেছে অবাঞ্ছিত। তাদের স্থান নেই পুঁজিবাদী ভারতবর্ষে। এই অবাঞ্ছিতদের বাসস্থান ও সংস্থান জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব না নিয়েও মুখে গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করলেও কংগ্রেসী নেতারা বর্ণ বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের যোগা-যোগের কথা সকলেরই জানা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ডিক্টেটর গুরু গলওয়ালকর —"The Muslims who have lived here for only eight hundred years are not entitled to be nationals of Hindusthan"—মুসলমানরা ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ৮শ বছর বাস করছে এবং হিন্দুস্থানের নাগরিক হবার অধিকার তারা পেতে পারে না—এ কথা প্রচার করা এবং ফ্যাসিবাদী কায়দায় সংগঠন গড়ে তোলার পরও তাঁকে কিছু বলা হয়নি। শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই এ বিভেদ আনার চেষ্টা যে চলেছে তা নয় এই গুরুটির মতে আবার "It is the lot of Maharashtrian Brahmins alone to lead the Hindus"—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরাই আবার সমগ্র হিন্দুদের পরিচালিত করার দায়িত্ব নেবে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মান্ধতার জোয়ারে অসংখ্য লোক প্রাণ হারাল এদেরই প্ররোচনায়, গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রে এরা লিপ্ত সর্বসমক্ষে প্রমান হ'ল তবুও সংঘের নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের দহরম মহরম সমানে চলল। ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে কোন প্রমান না থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর সরকারী খড়্গ একটার পর একটা পড়ে চলেছে আর যারা দেশের মধ্যে এই রকম একটা ফ্যাসিষ্ট সংগঠন গড়ে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা কিছুই নেই। সাম্প্রতিক সত্যাগ্রহের পর প্রত্যেক প্রদেশে কিছু সংখ্যক করে গ্রেপ্তার করলেও পিছন দিক দিয়ে চেষ্টা চলেছে তাদের মুক্তির জন্যে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং সর্দ্দারজীর বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন নামে কংগ্রেসী হলেও তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সংঘের দেখভায় তিনি আজ রাজর্ষি উপাধি-ভূষিত; তাঁর প্রত্যেক বক্তৃতা সংঘের বিভিন্ন মুখপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা শোভিত করে; তাঁর দলীয় লোকেরা গুরু গলওয়ালকরকে হিন্দী প্রচার সভার সভাপতি করার প্রস্তাব আনে, এবং এখনো যাতে সমগ্র সংঘকে আইনসম্মত করে দেওয়া ও প্রত্যেক কর্ম্মীকে মুক্ত করা যায় তার জন্য গোপন শলাপরামর্শ চলেছে ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে।

সংঘের প্রতি জনসাধারণের বিরাগের কথা নেতারা ভাল করেই জানেন তাই একদিকে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা চলেছে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা দলকে ভারতবর্ষে বেআইনী করে দেওয়া হবে অন্য দিকে প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে কংগ্রেসের মধ্যে স্থান দেবার চেষ্টা চলেছে। সর্দারজী ও ট্যাণ্ডনজী ত প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন—"আর. এস, এস, এর কংগ্রেসের বাইরে না থেকে কংগ্রেসের ভেতরে থাকাই উচিত।" এইভাবে ফ্যাসিবাদী প্রতিষ্ঠানকে আইনসম্মত করা হবে এবং কংগ্রেসের মধ্যে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীলদের একত্র সমাবেশ সম্ভব হবে। উদ্দেশ্য—ভারত-বর্ষে বামপন্থী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করা। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে সংঘের চালকদের যে কথাবার্ত্তা চলেছে তাতে প্রকাশ সাম্যবাদকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে সর্বপ্রকারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংঘ। সুতরাং এর পর সংঘকে ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মিশে যেতে দেখলে কিংবা কংগ্রেসী নেতাদের দয়ায় সংঘ আইনসম্মত বলে গণ্য হলে অবাক হবার কিছু নেই।

ফ্যাসিবাদকে রুখতে হবে

জনসাধারণ চায় শান্তি, জনসাধারণ চায় ভালভাবে খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচতে। ধর্ম্ম তাকে সে সুবিধা দিতে পারে না দেবেও না। হিন্দু পুঁজিপতি হিন্দু শ্রমিককেও শোষণ করে মুসলমান জমিদার-জোত-দারের দল মুসলমান প্রজাদের শোষণ থেকে নিষ্কৃতি দেয় না। শোষণ বিষয়ে পুঁজিপতিদের মধ্যে ধর্ম্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একতা আছে। বিড়লা এবং ইস্পাহানী বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক হলেও সাধারণ হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য বর্ণকে শোষণ তারা একসঙ্গে অনেক জায়গায় করছে। সমস্ত পুঁজি-পতিরাই একজাতের আর সমস্ত শোষিতরাও একজাতের; জগতে এই দুটো জাতিই আছে এটা জনসাধারণকে ভালভাবে বুঝতে হবে। শোষিতের দল শোষকের চেয়ে বহু গুণে বেশী, তারা ঐক্যবদ্ধ হলে পুঁজিপতিদের একদিনও টিকে থাকা সম্ভব নয় বলেই ধর্ম্মের কথা বলে তাদের মধ্যে বিভেদ এনে দেওয়া হয় তাদের দুর্বল করে দেওয়া হয়। অথচ মানুষের মত বাঁচতে হলে চাই জনরাষ্ট্র গঠন। তা সম্ভবই হবে না যদি শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, যদি সংগ্রাম করে ক্ষমতা দখল করার জন্যে নিজেদের দল গড়তে না পারে। কংগ্রেস যে সে দল নয় তার প্রমান ইতিমধ্যেই মিলেছে। আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের ঠিক ভাল হবে এরকম একটা কাজও করে নি। পুঁজিপতিদের লাভের অঙ্ক ঠিক রাখার জন্য চাষী ও মজুরের উপর গুলি ও লাঠিই চালিয়েছে। এর উপর দেশের মধ্যে যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে তাদের কংগ্রেসের মধ্যে সংগঠিত করা হচ্ছে দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করার উদ্দেশ্যে। একে বিফল করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে জনসাধারণকে। তার জন্যে প্রত্যেক অঞ্চলে কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবিরোধী গণফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। এদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর ভালভাবে বাঁচার পথ তৈরী হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এজেণ্ট কমরেডদের প্রতি

বিভিন্ন জেলার এজেণ্ট কমরেডদের কাছে গণদাবীর বিশেষ সংখ্যা এবং তার পরের ৩ টি সংখ্যার দাম বাকী পড়িয়াছে; এ সমস্ত বাকীর জন্য গণদাবী কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। তাই যে সমস্ত জেলা এজেণ্টদের নিকট দাম বাকী পড়িয়া আছে তাঁহাদের অবিলম্বে দাম শোধ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। —গঃ পঃ

প্রগতিশীল শিল্প

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

সমাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তারপর পিকাসো এলেন। শিল্পকে বাস্তবন্দী করে উর্দ্ধগামী করলেন। তারপর ডালি,, মুর প্রভৃতি শিল্পীরা সুর-রিয়ালিজম্-এর ধুয়া তুলে শৈল্পিক বেশ্যাবৃত্তি সুরু করলেন। এখনো বুর্জোয়া শিল্প সেই আবর্ত্তেই ঘুরছে এবং তাদের শিল্পসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। তাতে আমরা মোটেই আশঙ্কিত নই। আমরা জানি তাদের শিল্পের পরিণতি এই খানেই।

কিন্তু আজকের শিল্পীরও বোঝার দিন এসেছে যে এইখানেই সমস্ত শিল্পের পরিণতি নয়। আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিল্পীকে এগুতে হবে। যে সমাজ তাকে জন্ম দিয়েছে তার প্রতি শিল্পীরও একটা কর্ত্তব্য আছে। শিল্পী তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সমাজ তাকে অস্বীকার করবে। শিল্পীর প্রতিভাকে প্রতিনিধি করছে যে সমাজ, সে সমাজের প্রকৃত রূপ, প্রকৃত চাহিদাই রূপলাভ করলে শিল্পী হবে সার্থক, সমাজ হবে তৃপ্ত। সমাজের সাথে সাথে শিল্পী তার প্রতিভাকে নিয়ে এগিয়ে যাবে নতুন সমাজের পথে নতুনতর শিল্পের সন্ধানে।

কিন্তু এই সমাজের চাহিদাকে রূপ দিতে গিয়ে শিল্পীও মুসকিলে পড়েছেন। তাঁরা মনে করেছেন Actual representation of objective reality-ই শিল্প। তাতে করে শিল্প কয়েক পা পিছিয়েই গিয়েছে। কারণ যে মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয় Naturalistic শিল্পের আমরা বিরুদ্ধ সমালোচনা করি, এই শিল্প অনেকটা সেই পর্য্যায়ে চলে গেছে। তফাৎ শুধু তখনকার objective reality-র সঙ্গে এখনকার objective reality-র। এ সব শিল্পীরা ভুল করেছেন; কারণ objective reality-র representation-ই শিল্প নয়, objective reality-র সঙ্গে শিল্পীর মানসিক সৃজনতা (বা Subjective মনের creativeness) যোগ করে গড়ে ওঠে শিল্প। এ কথা মনে করে আজ শিল্পীকে এগুতে হবে। সমাজের প্রগতিতে তার নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে হবে সমাজের চাহিদাকে রূপ দেওয়ার জন্য। তাকে আজ শিল্প সৃষ্টি করতে হবে খোঁজনের কাজে নয়—গঠনের কাজে।

আজ বিশ্বশিল্পে দেখা দিয়েছে অনির্দ্দিষ্ট অস্থিরতা, চিন্তার অনৈক্য, রাজনৈতিক মতানৈক্যের সংঘর্ষ। শিল্পের এই ভাঙ্গনের মধ্যেই সৃষ্টির আভাষ দেখা দিয়েছে। সে আভাষ সাম্যবাদী শিল্পের—যে শিল্প হবে পদ্ধতির দিক থেকে জাতীয় এবং আদর্শের দিক থেকে সমাজ তান্ত্রিক।

≡ প্রগতিশীল শিল্প ≡

লেখক

শীতেশ দাশগুপ্ত

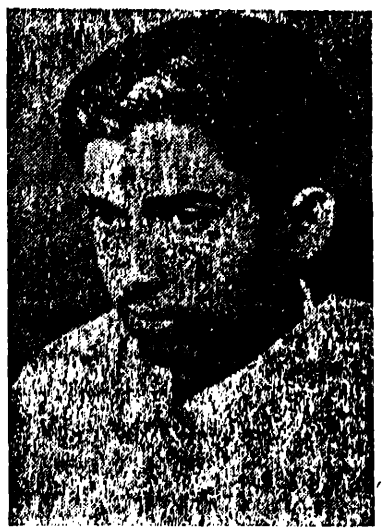

প্রগতিশীল শিল্পী, ছাত্র-নেতা, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টস ছাত্র-সংঘের সম্পাদক

পরিচিতি

[বিংশ শতাব্দী হল মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের ধ্বংস আর সাম্যবাদের অগ্রগতির যুগ। এ যুগে যা কিছু পুরাণ, যা কিছু বুর্জোয়া তাকে নিশ্চিহ্ন করে নোতুন এক শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলাই হল ঐতিহাসিক দায়িত্ব। যিনি নিজেকে প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে চাইবেন তাঁকেই নিতে হবে নোতুন সমাজ গড়ার এই গুরু দায়িত্ব আর তা থেকে সরে থাকার অর্থ—পুরান জীর্ণ সমাজকে টিকিয়ে রাখার সাহায্য করা, শোষণকে আরও বেশী দিন বেঁচে থাকতে পরোক্ষ সহযোগিতা করা। শিল্পী মানুষ, শিল্পী সমাজ ছাড়া নয় তাই তারও কর্ত্তব্য আছে এই দিকে। প্রগতিবাদী শিল্পী হতে হলে আজ তাই শিল্পকে শিল্পীর অবাস্তব কল্পনার মনিকোঠায় আটকে রাখলে চলবেনা, তাকে নেমে আসতে হবে মাটির পৃথিবীতে; মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানদের উপভোগের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে তাকে মিশিয়ে দিতে হবে জনতার মাঝে, মিলিয়ে দিতে হবে জনতার সাথে। শিল্পকে আজ হতে হবে সর্বাত্মক গণশিল্প, উদ্দেশ্য হবে তার আগামী সর্বহারা বিপ্লবের পথ কেটে চলা, লক্ষ্যে পৌঁছবার কাজে জনমানবকে টেনে আনা আর তাই শিল্পীর ষ্টুডিওর বন্ধঘরে রুদ্ধ থাকলে চলবে না; কর্মব্যস্ত পৃথিবী হবে তার ষ্টুডিও শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের অভিযানকে করতে হবে শিল্পের মডেল, শ্রমিকের হাতুড়ী, চাষীর কাস্তে, কেরানীর কলমের পেছনে দাঁড় করাতে হবে তুলিকে। এই মিলিত সংগ্রামকে রূপ দিতে হবে আগামী সুখী সমাজের প্রতিষ্ঠার দিনকে নিকটতর করবার জন্যে। যে শিল্পী তা করবেন বুর্জোয়া সমাজে প্রচারমূলক শিল্পবলে তাঁর সৃষ্টি অবহেলিত হলেও ভাবী বংশধরদের কাছে স্বীকৃতি মিলবে তাঁরই আর যিনি সে পথ ত্যাগ করে বিশুদ্ধ শিল্প রচনা করার নামে বর্ত্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক শ্রেণীকে অজ্ঞাতে সাহায্য করতে বাধ্য হবেন ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করবে না, স্থান তার হবে জীর্ণ সমাজের ধ্বংসের আবর্জ্জনার স্তূপে। এ ইঙ্গিত বোঝেন এবং আন্তরিকভাবে স্বীকার করেন বলেই যাঁদের ছবি প্রকাশিত হল তাঁরা সকলেই শিল্পের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পক্ষাতিকে সাহায্য করছেন, জনসাধারণের সংগ্রাম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেন নি এবং এই কারণেই এঁরা প্রগতিবাদী শিল্পী এঁদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে উঠবে ভারতবর্ষের শিল্পের নোতুন যুগ।

—সম্পাদক গণদাবী]

মজুর। —তাপস

প্রগতিশীল শিল্প আমার আলোচনার বিষয় কিন্তু শিল্পকলার প্রগতির ইতিহাসও আমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে বিষয়ের ভূমিকারূপে।

শিল্প মানুষের মননশীলতার এমন একটি অবদান, যা' মানুষেরই প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছিল, যা' মানুষকে আনন্দ দেয়, শিক্ষা দেয় পথ দেখায়। শিল্প মানে ছবি নয়, ভাস্কর্য্য নয়। শিল্প হচ্ছে ছবি ভাস্কর্য্য প্রভৃতির জন্মের প্রথম পদক্ষেপ থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সব রূপকীর্ত্তি হয়েছে তারই সামগ্রিক রূপের প্রকাশ।

শিল্পের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মনের সঙ্গে দেহের যেমন সম্পর্ক শিল্পের সঙ্গে বাস্তবতারও অনেকটা সেই সম্পর্ক। সভ্যতার প্রারম্ভে শিল্পের উৎপত্তি হল প্রয়োজনের তাগিদে। মানে তখন মানুষের পারিপার্শ্বিক থেকে আহরণ করা চিন্তা বাইরে বেরুবার পথ খুঁজতে থাকে, ভালভাবে কথা বলার আগে। অক্ষর লিখবার আগে ছবি হ'ল। কি নিয়ে ছবি হল? ছবি হল সেই নব্য প্রস্তর যুগে যে সব জন্তু জানোয়ার মানুষের চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন এনেছিল তাদের নিয়ে। সে যুগের সমস্ত ছবি তৎকালীন জীবনযাত্রার প্রধান উপায় শীকার এবং গোষ্ঠীযুদ্ধকে নিয়ে আঁকা। এমনি ভাবে শিল্প বাস্তবতাকে মূলধন করে এগিয়ে এসেছে আমরা দেখেছি।

কিন্তু আজকের যুগের শিল্পে আমরা বাস্তবতার চিহ্নও খুঁজে পাইনা আকাশচারী বুর্জোয়া শিল্প তার চরম উন্নতি করেছে। আজ তার প্রগতি রুদ্ধ; তার রূপ সীমাবদ্ধ। আদর্শের দিক থেকে বুর্জোয়া শিল্প এমন একটা আবেষ্টনির মধ্যে এসে পড়েছে, তাতে মানুষের বোধ্য কিছুই নেই। এতে শিল্প যে আদর্শচ্যুত হয়েছে সন্দেহ নেই।

সমাজকে প্রগতির পথে চালিত করার দায়িত্ব আছে শিল্পের। বুর্জোয়া শিল্পীদের শিল্পের এই সামাজিক মূল্য বোধগম্য হয়নি। তাঁরা শিল্পকে ব্যক্তির খেয়াল খুসীর expression বলে মানেন। কিন্তু তাঁদের আপাত নিরপেক্ষ খেয়ালখুসীর ছবি যে সমাজের অগ্রগতিকে কতটা ব্যাহত করছে তা' তাঁরা বুঝতেও পারেন না। এবং সেই সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়ারা তাঁদের ছবির সদ্ব্যবহারও করে থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাতিশের পরীক্ষামূলক কাজ বুর্জোয়া

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

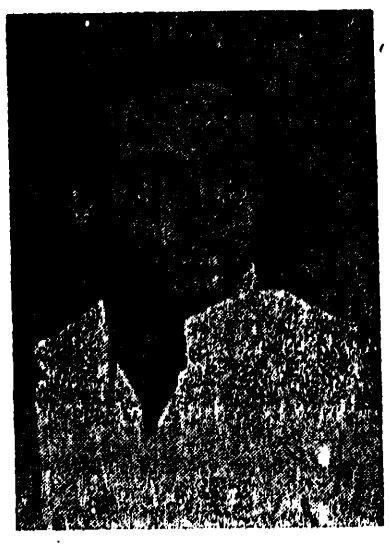

প্রগতিশীল শিল্পী ও ছাত্রনেতা বাণীকুমার মজুমদার

ওরা চাষ ক'রে ঘাস পায় না। —শীতেশ

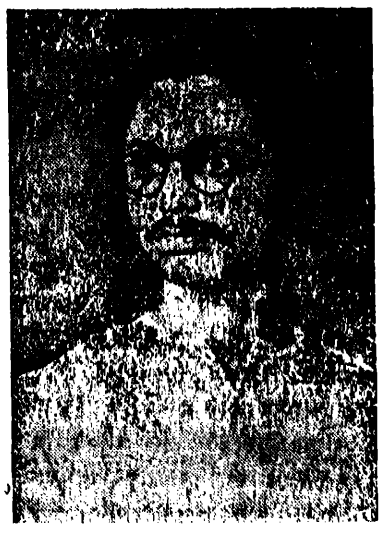

প্রগতিশীল শিল্পী ও ছাত্রনেতা তাপস দত্ত

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক আর্ট প্রেস, ২০ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কার্য্যালয়—১ এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭